৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। **মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল** (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৪৭- এপ্রিল ১৭, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাবিবুর রহমান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার ছিলেন। শৈশব থেকেই দুঃসাহসী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। পড়াশোনা বেশিদূর করতে পারেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর উচচ বিদ্যালয়ে দু-এক বছর অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৭-র ১৬ ডিসেম্বর বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক। ১৯৭১-এর প্রথম দিকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে ঘিরে তিনটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে এন্ডারসন খালের পাঁড়ে। আখাউড়ায় অবস্থিত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দক্ষিন দিক থেকে নিরাপত্তার জন্য দরুইন গ্রামের দুই নম্বর প্লাটুনকে নির্দেশ দেয়। সিপাহী মোস্তফা কামাল ছিলেন দুই নম্বর প্লাটুনে। কর্মতৎপরতার জন্য যুদ্ধের সময় মৌখিকভাবে তাঁকে ল্যান্স নায়েকের দ্বায়িত্ব দেয়া হয়।

যেভাবে শহীদ হলেন:

---

১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুমিল্লা-আখাউড়া রেললাইন ধরে উত্তর দিকে এগুতে থাকে। ১৭ই এপ্রিল পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী দরুইন গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর মর্টার ও আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ শুরু করলে মেজর শাফায়াত জামিল ১১ নম্বর প্লাটুনকে দরুইন গ্রামে আগের প্লাটুনের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে হাবিলদার মুনির দরুইনে পৌছেন। সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তার নিকট থেকে গুলি নিয়ে নিজ পরিখায় অবস্থান গ্রহন করেন। বেলা ১১ টার দিকে শুরু হয় শত্রুর গোলাবর্ষণ। সেই সময়ে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সাড়ে ১১টার দিকে মোগরা বাজার ও গঙ্গা সাগরের শত্রু অবস্থান থেকে গুলি বর্ষিত হয়। ১২ টার দিকে আসে পশ্চিম দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ। প্রতিরক্ষার সৈন্যরা আক্রমণের তীব্রতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। কয়েক জন শহীদ হন। মোস্তফা কামাল মরিয়া হয়ে পাল্টা গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর পূর্ব দিকের সৈন্যরা পেছনে সরে নতুন অবস্থানে সরে যেতে থাকে এবং মোস্তফাকে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তাদের সবাইকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগের জন্য মোস্তফা পূর্ণোদ্যমে এল.এম.জি থেকে গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর ৭০ গজের মধ্যে শত্রুপক্ষ চলে এলেও তিনি থামেননি। এতে করে শত্রু রা তাঁর সঙ্গীদের পিছু ধাওয়া করতে সাহস পায়নি। এক সময় গুলি শেষ হয়ে গেলে, শত্রুর আঘাতে তিনিও লুটিয়ে পড়েন।

২। **মোহাম্মদ রুহুল আমিন** (১৯৩৫ - ডিসেম্বর ১০, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:

মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলার বাঘচাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আজহার পাটোয়ারী, মাতা জোলখা খাতুন। রুহুল আমিন বাঘচাপড়া প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে আমিষাপাড়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৩-তে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন। আরব সাগরে অবস্থিত মানোরা দ্বীপে পি.এন.এস বাহাদুর-এ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পি.এন.এস. কারসাজে যোগদান করেন। ১৯৫৮-তে পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষ করেন। ১৯৬৫ -তে মেকানিসিয়ান কোর্সের জন্য নির্বাচিত হন। পি.এন.এস. কারসাজে কোর্স সমাপ্ত করার পর আর্টিফিসার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ -তে চট্টগ্রাম পি.এন.এস. বখতিয়ার নৌ-ঘাটিঁতে বদলি হয়ে যান। ১৯৭১-এর এপ্রিলে ঘাটিঁ থেকে পালিয়ে যান। ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে ২ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে থেকে বিভিন্ন স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী গঠিত হলে কলকাতায় চলে আসেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কে দুটি গানবোট উপহার দেয়। গানবোটের নামকরণ করা হয় 'পদ্মা' ও 'পলাশ'। রুহুল আমিন পলাশের প্রধান ইঞ্জিনরুমে আর্টিফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যেভাবে শহীদ হলেন:

---

৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী যশোর সেনানিবাস দখলের পর 'পদ্মা', 'পলাশ' এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর একটি গানবোট 'পানভেল' খুলনার মংলা বন্দরে পাকিস্তানি নৌ-ঘাটিঁ পি.এন.এস. তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-এ প্রবেশ করে। ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার দিকে গানবোটগুলো খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে এলে অনেক উচুঁতে তিনটি জঙ্গি বিমানকে উড়তে দেখা যায়। শত্রুর বিমান অনুধাবন করে পদ্মা ও পলাশ থেকে গুলি করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযানের সর্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন মনেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিমান মনে করে গুলিবর্ষণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এর কিছুক্ষণ পরে বিমানগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে নিচে নেমে আসে এবং আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। গোলা সরাসরি 'পদ্মা' এর ইঞ্জিন রুমে আঘাত করে ইঞ্জিন বিধ্বস্ত করে। হতাহত হয় অনেক নাবিক। 'পদ্মা'-র পরিণতিতে পলাশের অধিনায়ক লে. কমান্ডার রায় চৌধুরী নাবিকদের জাহাজ ত্যাগের নির্দেশ দেন। রুহুল আমিন এই আদেশে ক্ষিপ্ত হন। তিনি উপস্থিত সবাইকে যুদ্ধ বন্ধ না করার আহ্বান করেন। কামানের ক্রুদের বিমানের দিকে গুলি ছুড়ঁতে বলে ইঞ্জিন রুমে ফিরে আসেন। কিন্তু অধিনায়কের আদেশ অমান্য করে বিমানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিমানগুলো উপূর্যপুরি বোমাবর্ষণ করে পলাশের ইঞ্জিনরুম ধ্বংস করে দেয়। শহীদ হন রুহুল আমিন।

৩। **মুন্সী আব্দুর রউফ**(১৯৪৩ - এপ্রিল ৮, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মুন্সি আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার বোয়ালখালী উপজেলার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মেহেদী হোসেন এবং মাতার নাম মকিদুন্নেসা। কিশোর বয়সে রউফ-এর পিতা মারা যান। ফলে তিনি উচচশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৩-র ৮ মে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ ভর্তি হন। তাঁর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ১৩১৮৭। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ কর্মরত ছিলেন। সে সময় তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন।

যেভাবে শহীদ হলেন:

৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পনীর সাথে বুড়িঘাটে অবস্থান নেন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি জলপথ প্রতিরোধ করার জন্য ৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের দুই কোম্পানী সৈন্য, সাতটি স্পীড বোট এবং দুটি লঞ্চে করে বুড়িঘাট দখলের জন্য অগ্রসর হয়। তারা প্রতিরক্ষি বূহ্যের সামনে এসে ৩" মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র দিয়ে হঠাৎ অবিরাম গোলা বর্ষন শুরু করে। গোলাবৃষ্টির তীব্রতায় প্রতিরক্ষার সৈন্যরা পেছনে সরে বাধ্য হয়। কিন্তু ল্যান্সনায়ক আব্দুর রউফ পেছনে হটতে অস্বীকৃতি জানান। নিজ পরিখা থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করেন। মেশিনগানের এই পাল্টা আক্রমনের ফলে শত্রুদের স্পীড বোট গুলো ডুবে যায়। হতাহত হয় এর আরোহীরা। পেছনের দুটো লঞ্চ দ্রুত পেছনে গিয়ে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শুরু করে দুরপাল্লার ভারী গোলাবর্ষণ। মর্টারের ভারী গোলা এসে পরে আব্দুর রউফের উপর। লুটিয়ে পড়েন তিনি, নীরব হয়ে যায় তাঁর মেশিনগান। ততক্ষণে নিরাপদ দূরুত্বে সরে যেতে সক্ষম হন তাঁর সহযোদ্ধারা।

শহীদ ল্যান্স নায়েক বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য জেলা রাঙামাটির নানিয়ার চড়ে। তাঁর অপরিসীম বীরত্ব,সাহসীকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্ব্বোচ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করে।

৪। **মোহাম্মদ হামিদুর রহমান**(ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৫৩- অক্টোবর ২৮, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত ডুমুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্বাস আলী মন্ডল, মাতা মোসাম্মাৎ কায়সুন্নেসা। হামিদুর রহমানের স্থায়ী নিবাস ঘরোদা, খালিশপুর, খুলনা। খালিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় নাইট স্কুলে সামান্য লেখাপড়া করেন। ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। যোগদানের পরই চট্টগ্রামের সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণের জন্য যান। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমনের মুখে চাকরীস্থল থেকে নিজ গ্রামে চলে আসেন। বাড়ীতে একদিন থেকে পরদিনই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য চলে যান সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার ধলই চা বাগানের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ধলই বর্ডার আউটপোস্টে। সেখানে ১ম ইস্টবেঙ্গলের সি কোম্পানির হয়ে ধলই বর্ডারের ফাঁড়ি দখল করার অভিযানে অংশ নেন। সেই অভিযানে শহীদ হন। সীমান্তের নিকট আম্বাসা গ্রামে হামিদুর রহমানকে দাফন করা হয়।

যেভাবে শহীদ হলেন:

১৯৭১ সালের ২৭ অক্টোবর রাতে সি কোম্পানী যাত্রা করে ধলই বর্ডারের ফাঁড়ি দখল করতে। ভোর চারটায় লক্ষস্থলের কাছে পৌছে অবস্থান নেয়। সামনে দু প্লাটুন ও পেছনে এক প্লাটুন সৈন্য অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে

থাকে শত্রু অভিমুখে। শত্রু অবস্থানের কাছাকাছি এলে একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে শত্রু পক্ষ হতে অবিরাম গুলিবর্ষণ শুরু হয়। শত্রু পক্ষের এল.এম.জি -র কারনে মুক্তিযোদ্ধাদের এগুনো বন্ধ হয়ে যায়। তখন শত্রু র এল.এম.জি কে নিষ্ক্রিয় করার জন্য ক্রলিং করে এগিয়ে যান সিপাহী হামিদুর রহমান। ঝাঁপিয়ে পড়েন এল.এম.জি-র অবস্থানের উপড়। নিহত হয় এল.এম.জি-র চালকদ্বয়। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায় এল.এম.জি এবং গুলির আঘাতে নিস্তব্ধ হয়ে যান হামিদুর রহমান নিজেও। দুর্বার গতিতে মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয় দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। নিজের জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেন এই বীর সিপাহী।

৫। **নূর মোহাম্মদ শেখ**(ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৩৬- সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে নূর মোহাম্মদ শেখ জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা জেন্নাতুন্নেসা। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার লেখাপড়া শেষ না করে ১৯৫৯-এর ১৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এ যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে নূর মোহাম্মদকে দিনাজপুর থেকে যশোরে বদলি করা হয়। বদলি স্থানে যোগ দানের আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন।

যেভাবে শহীদ হলেন:

১৯৭১- এর ৫ সেপ্টেম্বর সুতিপুরে নিজস্ব প্রতিরক্ষার সামনে গোয়ালহাটি গ্রামে নূর মোহাম্মদকে অধিনায়ক করে পাঁচ জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং পেট্রোল পাঠানো হয়। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্থানি সেনাবাহিনী পেট্রোলটি তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষন করতে থাকে। পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষন করা হয়। তবু পেট্রোলটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এক সময়ে সিপাহী নান্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নূর মোহাম্মদ নান্নু মিয়াকে কাঁধে তুলে নেন এবং হাতের এল.এম.জি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপসরণ করতে বাধ্য হয়। হঠাৎ করেই শত্রুর মর্টারের একটি গোলা এসে লাগে তাঁর ডান কাঁধে। ধরাশয়ী হওয়া মাত্র আহত নান্নু মিয়াকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। হাতের এল.এম.জি সিপাহী মোস্তফাকে দিয়ে নান্নু মিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন এবং মোস্তফার রাইফেল চেয়ে নিলেন যতক্ষণ না তাঁরা নিরাপদ দূরুত্বে সরে যেতে সক্ষম হন ততক্ষণে ঐ রাইফেল দিয়ে শত্রুসৈন্য ঠেকিয়ে রাখবেন এবং শত্রুর মনোযোগ তাঁর দিকেই কেন্দ্রীভুত করে রাখবেন। অন্য সঙ্গীরা তাদের সাথে অনুরোধ করলেন যাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে গেলে সবাই মারা পড়বে এই আশঙ্কায় তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। বাকিদের অধিনায়োকোচিত আদেশ দিলেন তাঁকে রেখে চলে যেতে। তাঁকে রেখে সন্তর্পণে সরে যেতে পারলেন বাকিরা। এদিকে সমানে গুলি ছুড়তে লাগলেন রক্তাক্ত নূর মোহাম্মদ। একদিকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী, সঙ্গে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, অন্যদিকে মাত্র অর্ধমৃত সৈনিক (ই.পি.আর.) সম্বল একটি রাইফেল ও সীমিত গুলি। এই অসম অবিশ্বাস্য যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের এমন ক্ষতিসাধন করেন যে তারা এই মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধাকে বেয়নেট দিয়ে বিকৃত করে চোখ দুটো উপড়ে ফেলে। পরে প্রতিরক্ষার সৈনিকরা এসে পাশের একটি ঝাড় থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

৬। **বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান** (২৯ অক্টোবর, ১৯৪১ - ২০ আগস্ট, ১৯৭১) একজন বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারীদের একজন। পরবর্তিতে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি পুরোন ঢাকার আগাসাদেক রোডে জন্মগ্রহন করেন। বাবা মৌলভী আবদুস সামাদ, মা সৈয়দা মোবারকুন্নেসা খাতুন।

জীবনী:

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেনী পাস করার পর সারগোদায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ডিস্টিংকসহ মেট্রিক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে রিসালপুর পি,এ,এফ কলেজ থেকে কমিশন লাভ করেন এবং জেনারেল ডিউটি পাইলট হিসাবে নিযুক্ত হন। এরপর করাচির মৌরীপুরে জেট কনভার্সন কোর্স সমাপ্তি করে পেশোয়ারে গিয়ে জেটপাইলট হন। ১৯৬৫ তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ফ্লাইং অফিসার অবস্থায় কর্মরত ছিলেন। এরপর মিগ কনভার্সন কোর্সের জন্য পুনরায় সারগোদায় যান। সেখানে ১৯৬৭ সালের ২১ জুলাই তারিখে একটি মিগ-১৯ বিমান চালানোর সময় আকাশে সেটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে দক্ষতার সাথে প্যারাসুট যোগে মাটিতে অবতরণ করেন। ইরানের রানী ফারাহ দিবার সম্মানে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত বিমান মহড়ায় তিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালি পাইলট। রিসালপুরে দু'বছর ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হিসাবে কাজ করার পর ১৯৭০ এ বদলি হয়ে আসেন জেট ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় ছুটিতে আসেন।

যেভাবে শহীদ হলেন:

---

২৫ মার্চের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। পরে তিনি দৌলতকান্দিতে জনসভা করেন এবং বিরাট মিছিল নিয়ে ভৈরব বাজারে যান। পাক-সৈন্যরা ভৈরব আক্রমণ করলে বেঙ্গল রেজিমেন্টে ই,পি,আর-এর সঙ্গে থেকে প্রতিরোধ বুহ্য তৈরি করেন। এর পরই কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে একটি জঙ্গি বিমান দখল এবং সেটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। ১৯৭১ এর ২০ আগস্ট শিক্ষার্থী মিনহাজ রশীদের কাছ থেকে টি-৩৩ বিমানটি ছিনতাই করে উড়ে যাবার সময় ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে থাট্টা এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। তাঁর মৃতদেহ ঘটনাস্থল হতে প্রায় আধ মাইল দূরে পাওয়া যায়।

মিলি রহমান বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের স্ত্রী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন, ফ্লাইট ল্যাফটেনেন্ট মতিউর রহমান শহীদ হবার সময় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। পাকিস্তানিরা তাঁকে এক অন্ধকার কক্ষে তাঁর শিশু বাচ্চা ও কাজের পরিচারিকাসহ দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখে ও অত্যাচার করে। মুক্তি পাবার পর তিনি বাংলাদেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

২০০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়।

৭। **মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর** (১৯৪৮- ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ১৯৪৮ সালে বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার। জাহাঙ্গীর ১৯৬৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯৬৬ তে আই.এস.সি পাশ করার পর বিমান বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু চোখের অসুবিধা থাকায় ব্যর্থ হন। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৮-র ২ জুন তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন লাভ করেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি পাকিস্তানে ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ানে কর্তব্যরত ছিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি ছুটে এসেছিলেন পাকিস্তানের দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। ৩ জুলাই পাকিস্তানে আটকে পড়া আরো তিনজন অফিসারসহ তিনি পালিয়ে যান ও পরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ৭নং সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডার হিসাবে যোগ দেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখানোর কারণে তাঁকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখলের দ্বায়িত্ব দেয়া হয়। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বিজয় সুনিশ্চিত করেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ আঙিনায় সমাহিত করা হয়।

যেভাবে শহীদ হলেন:

---

১০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট আউয়াল ও ৫০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশ্চিমে বারঘরিয়া এলাকায় অবস্থান গ্রহন করেন। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বারঘরিয়া এলাকা থেকে ৩/৪ টি দেশী নৌকায় করে রেহাইচর এলাকা থেকে মহানন্দা নদী অতিক্রম করেন। নদী অতিক্রম করার পর উত্তর দিক থেকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি শত্রু অবস্থানের দখল নিয়ে দক্ষিণে এগোতে থাকেন। তিনি এমনভাবে আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিলেন যেন উত্তর দিক থেকে শত্রু নিপাত করার সময় দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু কোনকিছু আঁচ করতে না পারে। এভাবে এগুতে থাকার সময় জয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত তখন ঘটে বিপর্যয়। হঠাৎ বাঁধের উপর থেকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের ৮/১০ জন সৈনিক দৌড়ে চর এলাকায় এসে যোগ দেয়। এরপরই শুরু হয় পাকিস্তান বাহিনীর অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জীবনের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যান। ঠিক সেই সময়ে শত্রুর একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় জাহাঙ্গীরের কপালে। শহীদ হন তিনি।

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com